بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২২ মে, ২০২৬ মোতাবেক ২২ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের একটি দিক তথা বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। আজও সেই একই আলোচনা অব্যাহত থাকবে। তাঁর (সা.) বিনয়ের মান কীরূপ ছিল! ছোটো ছোটো বিষয়ের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি (সা.) তা প্রকাশ করতেন। যেমন, হযরত ইয়াহিয়া বিন আবী কাসীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি সেভাবেই খাই যেভাবে একজন দাস খায় এবং সেভাবেই বসি যেভাবে একজন দাস বসে, কারণ আমিও তো একজন বান্দা মাত্র। অর্থাৎ, নেতাদের ও ধনীদের মতো অহংকার ও আত্মশ্লাঘা আমার মাঝে নেই।

অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি উটনী ছিল যার নাম ছিল 'আযবা'। এটি এত দ্রুতগামী ছিল যে, কোনো উট এর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারত না। একবার এক বেদুইন তার একটি জোয়ান উটে চড়ে আসল এবং প্রতিযোগিতায় সেই উটটি আযবাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। মুসলমানদের কাছে এটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় ঠেকল যে, আযবা পেছনে পড়ে গেছে এবং তুমি এগিয়ে গেছ, অথবা উটটি যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সেটিকে থামিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কেননা এটি মহানবী (সা.)-এর উটনী। তাদের এই আচরণের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার; দুনিয়াতে তিনি যে জিনিসকে উঁচুতে ওঠান, তাকে নীচেও নামিয়ে থাকেন। এতে রাগ করার মতো কিছুই নেই, এটি তো আল্লাহ্ তা'লাই করে থাকেন। কোনো জিনিস ওপরেও যায়, আবার নীচেও নেমে আসে। সাধারণ মানুষ তো এমন কথায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সামনে সর্বদা খোদা তা'লার সত্তাই বিরাজমান ছিল এবং তিনি কেবল তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াকে দেখাতে চাইতেন। তিনি (সা.) কত-না বিনয়ের সাথে বলছেন, এতে রাগ করার কী আছে! কোনো প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা তো আল্লাহ্ তা'লারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

অতঃপর বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট উমরাহ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি (সা.) অনুমতি প্রদান করলেন এবং বললেন, হে আমার ভাই! নিজের দোয়ায় আমাকে ভুলো না। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এটি তিনি (সা.) এমন একটি কথা বলেছিলেন যার বিনিময়ে যদি পুরো দুনিয়াও আমার হস্তগত হতো, তবুও আমি এতটা আনন্দিত হতাম না। তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করাকে আল্লাহ্ তা'লা আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন এবং দোয়া কবুল হবার জন্যও একে আবশ্যক করেছেন। কিন্তু তাঁর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন! তিনি (সা.) তাঁর একজন অনুসারীকে বলছেন যে, 'আমার জন্য দোয়া কোরো'।

কোনো কাজ করতে তিনি (সা.) লজ্জাবোধ করতেন না এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজও তিনি (সা.) নিজে করে অন্যদের দেখাতেন, বরং শেখাতেনও। যেমন একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক বালকের

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; সে একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তখন তিনি (সা.) তাকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, পেছনে সরে যাও যেন আমি তোমাকে সঠিক পদ্ধতি দেখাতে পারি; কারণ আমার মনে হয় না– তুমি চামড়া ছাড়ানোতে পারদর্শী। এরপর তিনি (সা.) নিজের হাত চামড়া ও মাংসের মাঝখানে ঢোকান এবং তা ভেতর পর্যন্ত নিয়ে যান, এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এভাবে করো; হে বালক, এভাবে চামড়া ছাড়াও। তিনি (সা.) তার সমস্ত কাজ করেও দিলেন এবং তাকে শেখালেনও।

তারপর এমনিভাবে বিনয়ের সাথে অন্যদের কাজ করে দেবার আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত খাব্বাব (রা.)-র কন্যা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দুধ দোহনের জন্য ছাগল নিয়ে আসেন। তখন তিনি (সা.) সেটিকে বাঁধেন এবং সেটির দুধ দোহন করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমার কাছে তুমি তোমার বড়ো পাত্রটি নিয়ে আসো। *সে একটি পাত্র নিয়ে এসেছিল, তিনি (সা.) বলেন, না, এর চেয়েও বড়ো পাত্র আনো।* সুতরাং আমি একটি বড়ো পাত্র নিয়ে আসি এবং তিনি (সা.) তাতে দুধ দোহন করেন, এমনকি তা পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, নিজেও পান করো এবং তোমার প্রতিবেশীদেরও পান করাও। নিশ্চয়ই তাঁর (সা.) এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর (সা.) দোয়ার বরকতে দুধ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি (সা.) তাকে বলেন, এই বরকতে অন্যদেরও অংশীদার করো; আর সেই মুহূর্তে ছাগলটি থেকে দ্বিগুণ দুধ দোহন করা হয়েছিল।

সালাম করা এবং মজলিসে বসার বিষয়ে তাঁর (সা.) বিনয়পূর্ণ অবস্থা ও উন্নত নৈতিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, যখন কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সামনে আসত তখন তিনি (সা.) তার সাথে করমর্দন করতেন; তিনি (সা.) তার হাত থেকে নিজের হাত ততক্ষণ ছাড়িয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজে তার হাত ছাড়িয়ে নিত, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের পবিত্র চেহারা তার চেহারা থেকে ততক্ষণ ফেরাতেন না যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজে মুখ ফিরিয়ে নিত। আর তাঁকে (সা.) কখনো তাঁর সাথে বসা ব্যক্তির সামনে এমন পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায় নি।

হযরত আবু মুসান্না আমলুকী (রা.) থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর (সা.) পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) লাঠির সাহায্যে হাঁটতেন এবং তাতে ভর দিতেন। এই লাঠি কাউকে ত্রস্ত করার জন্য বা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য ছিল না; বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার সকাশে বিনয় ও নম্রতার প্রতীকস্বরূপ ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর বিনয় ছিল সবার চেয়ে বেশি।

আবার তিনি (সা.) বিনয়ের উপদেশও অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে প্রদান করতেন। একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; ইবনে হাযম (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে উটের মালিক ও ছাগলওয়ালাদের মাঝে অহংকার ও আত্মগৌরবের এক তর্কযুদ্ধ শুরু হলো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কথা বলছিল। উটের মালিকরা বলছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি বড়ো এবং সম্পদের অধিক প্রাচুর্য রয়েছে। ছাগলওয়ালারা বলছিল, আমরা (ছাগলের) সংখ্যার দিক থেকে বেশি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে, যখন এই তর্কযুদ্ধ ও বিতর্ক চলছিল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে গেলেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, হযরত মূসাকে (আ.) নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল, আর তিনি ছাগল চরাতেন। হযরত দাউদকেও (আ.) নবী

বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল, আর তিনিও ছাগল চরাতেন। আর আমাকেও নবী নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে, এবং আমিও 'আজইয়াদ' নামক স্থানে আমার পরিবারের ছাগল চরাতাম। এভাবে যারা অহংকার করছিল তাদেরকে তিনি (সা.) নসীহত করেন; আর যাদের ওপর অহংকার প্রকাশ করা হচ্ছিল অর্থাৎ ছাগলওয়ালাদের ছোটো মনে করা হচ্ছিল, তাদেরও তিনি (সা.) সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি (সা.) যে 'আজইয়াদ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন, এই আজইয়াদ হলো মক্কায় সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি স্থান। এই স্থানটিকে 'জিয়াদ'-ও বলা হয়।

তাঁর (সা.) মাঝে কোনো অহংকার ছিল না। গরিবদের সাথেও তিনি (সা.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মিশতেন এবং তাদের মনস্তুষ্টি করতেন। একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মরুনিবাসীদের মাঝে অর্থাৎ যারা গ্রামের বাসিন্দা ছিল, তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন যার নাম ছিল যাহির (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর জন্য গ্রামের বিভিন্ন উপহারসামগ্রী নিয়ে আসতেন, অর্থাৎ গ্রামে যে-সব জিনিস পাওয়া যেত তা নিয়ে আসতেন। আর যখন তিনি ফিরে যেতেন তখন মহানবী (সা.)-ও তাঁকে পর্যাপ্ত উপহারসামগ্রী ও জিনিসপত্র দিয়ে বিদায় জানাতেন। মহানবী (সা.) বলতেন, **যাহির হলো আমাদের মরুবাসী অর্থাৎ গ্রামের বন্ধু এবং আমরা তার শহুরে বন্ধু।** একদিন যাহির (রা.) বাজারে তার কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করছিলেন, তখন মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন এবং পেছন দিক থেকে তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। হযরত যাহির (রা.) মহানবী (সা.)-কে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু যখন তিনি ঘুরে তাকিয়ে মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন, তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বক্ষের সাথে নিজের কোমর ঘষতে থাকেন। মহানবী (সা.) (রসিকতা করে) বলতে আরম্ভ করেন, কে এই দাসকে কিনবে? হযরত যাহির (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), তাহলে তো আপনার এই ব্যাবসাতে লোকসান হবে! আমাকে কে কিনবে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্‌র সমীপে তুমি লোকসানজনক সওদা নও;** অথবা বলেছিলেন, **আল্লাহ্‌র দরবারে তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।**

এক খুতবায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন: মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন, জন্মগত কোনো ত্রুটির কারণে যাঁর চেহারা খুব একটা সুন্দর ছিল না এবং তিনি চরম দরিদ্রও ছিলেন। তার শরীর এবং কাপড়চোপড় ধূলিমলিন ছিল। এরকম প্রচণ্ড ঘর্মাক্ত অবস্থাতেই তিনি বাজারে কারো কোনো জিনিস বিক্রি করছিলেন। কিন্তু এই সাহাবীর মাঝে এমন কিছু ছিল, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যেটির অনেক মূল্য ছিল; তিনি (সা.) তাকে অনেক মূল্যায়ন করতেন। এমতাবস্থায় যখন তার নিজেরই নিজের প্রতি ঘেন্না লাগছিল, নিজের সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'আমি ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে আছি, আমার গায়ে ধূলোবালি লেগে আছে' এবং হয়ত তিনি নিজেও সংকোচবোধ করছিলেন; মহানবী (সা.) তখন তার পেছন দিক থেকে আসেন এবং যেভাবে শিশুদের সাথে খেলা হয়, (সেভাবে) নিজের দুই হাত দিয়ে তার চোখ চেপে ধরেন। তিনি (রা.) হাত দিয়ে স্পর্শ করে ঠাহর করেন, এটি মহানবী (সা.)-এরই হাত হবে। কারণ মহানবী (সা.)-এর শরীরে লোম ছিল না অথবা খুব কম ছিল এবং তাঁর শরীরও অত্যন্ত মোলায়েম ছিল। তখন তিনিও ভালোবাসার আতিশয্যে নিজের শরীর মহানবী (সা.)-এর শরীরের সাথে ঘষতে আরম্ভ করেন, যার ফলে মহানবী (সা.)-এর শরীর এবং কাপড় ময়লা হতে থাকে; কিন্তু মহানবী (সা.) এটি আদৌ অপছন্দ করেন নি। মহানবী (সা.) তার ওপর

হাত রাখেন এবং বলেন, এ হলো আমার দাস, একে কেনার মতো কেউ আছে কি? এ কথায় সেই সাহাবী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং হুযূর (সা.)-কে বলেন, হে আমার মনিব! এ তো এক অলাভজনক ও মূল্যহীন জিনিস! একে কে কিনবে? মহানবী (সা.) বলেন, কক্ষনো না! আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এর অনেক মূল্য রয়েছে।

হযরত হাসান বিন আলী (রা.) তাঁর (সা.) উন্নত নৈতিক চরিত্র, মানুষের সাথে বিনয় ও সদাচরণের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর (সা.) মর্যাদা ও মহিমার চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ বিন আবী হালা (রা.)-র কাছে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আকৃতি-অবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি মহানবী (সা.)-এর আকৃতি-অবয়ব খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন এবং আমি চাচ্ছিলাম, আমার সামনে যেন তিনি এর কিছুটা উল্লেখ করেন। তখন তিনি বলেন, মহানবী (সা.) অত্যন্ত সৌম্য দর্শন ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারা এমনভাবে জ্বলজ্বল করত ঠিক যেন তা চতুর্দশীর চাঁদ। এরপর তিনি এই পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি বর্ণনা করেন; বিস্তারিত চিত্র বর্ণনা করেন। হযরত হাসান (রা.) বলেন, তিনি (তথা হিন্দ বিন আবী হালা) আমাকে যে-সব তথ্য দিয়েছিলেন, আমি তা হযরত হুসাইন (রা.)-র কাছ থেকে দীর্ঘদিন গোপন রেখেছিলাম। পরে যখন তার কাছে বর্ণনা করি তখন জানতে পারি, তিনি ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে আমার চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন এবং আমি তার (হিন্দ) কাছে যা কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি আমার আগেই তাকে তা জিজ্ঞেস করেছেন। বরং এটিও জানতে পারি, তিনি তার পিতার (তথা হযরত আলীর) কাছেও মহানবী (সা.)-এর ঘরে আসা-যাওয়া এবং তাঁর (সা.) আকৃতি-অবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন এবং কোনো বিষয়ই বাদ দেন নি। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার কাছে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে প্রবেশের বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। *আগের কথাগুলো ছিল বাড়ির বাইরের; বাড়ির ভেতরের কথা যখন হযরত আলী (রা.)-র কাছে জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি বলেন,* যখন মহানবী (সা.) নিজের গৃহে আসতেন, তখন তিনি ঘরের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। একটি ভাগ মহান আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াক্‌ফ বা উৎসর্গ করতেন, একটি ভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য এবং একটি ভাগ নিজের জন্য রাখতেন। এরপর নিজের ভাগটিকেও তিনি নিজের ও অন্যান্য মানুষের মাঝে বণ্টন করে নিতেন। আর এসময়ে বিশেষ সাহাবীদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় বিষয়াদি পৌঁছে দিতেন এবং তাদের থেকে কোনো বিষয়ই লুকিয়ে রাখতেন না। আর তাঁর (সা.) জীবনচরিতে উম্মতের জন্য নির্ধারিত অংশের বণ্টনের পদ্ধতিটি এমন ছিল যে, সাক্ষাতের অনুমতি দেবার ক্ষেত্রে উম্মতের মধ্যে সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং ধর্মীয় মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের মাঝে এই সময় বণ্টন করা হতো। তাদের মধ্যে কারো একটি, কারো দুটি এবং কারো একাধিক প্রয়োজন থাকত। তিনি (সা.) তাদের প্রয়োজন মেটাতে তাদের সাথে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাদের প্রশ্নাবলির আলোকে তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করতেন, যা তাদের ও উম্মতের সংশোধন করতে পারে। আর তাদেরকে এমন সব বিষয়ে অবগত করতেন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আর তিনি (সা.) বলতেন, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিতদের কাছে এসব কথা পৌঁছে দিও; আর আমার কাছে সেসব ব্যক্তির প্রয়োজনের কথা পৌঁছাবে যারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা (নিজেরা) পৌঁছাতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি এমন কারো প্রয়োজনের কথা কোনো শাসকের নিকট পৌঁছায় যে নিজে তা পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে না, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তাকে

দৃঢ়তা দান করবেন। এতে সেসব পদাধিকারীর জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করা হয়েছে; তাদের উচিত কেন্দ্রকে দুর্বল ও অভাবীদের (প্রয়োজনের) কথা পৌঁছে দেওয়া।

তাঁর (সা.) কাছে এমন বিষয়গুলোই আলোচিত হতো এবং এগুলোর বাইরে তিনি কারো কাছ থেকে অন্য কোনো কথা গ্রহণ করতেন না। মানুষ তাঁর (সা.) নিকট প্রত্যাশা নিয়ে আসত এবং কিছু না নিয়ে ফিরে যেত না; বরং তারা কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী হয়ে বের হতো। তিনি, অর্থাৎ হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, তারপর আমি আমার পিতার কাছে মহানবী (সা.)-এর বাড়ি থেকে বাইরে বের হবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করি যে, এ সময়ে তিনি কী করতেন? তিনি বলেন, মহানবী (সা.) উদ্দেশ্যমূলক ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোনো কথা বলতেন না। তিনি (সা.) সাহাবীদের মনস্তুষ্টি করতেন এবং তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতেন না। প্রত্যেক জাতির সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিতেন। তিনি (সা.) মানুষকে সতর্ক করতেন এবং তাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের প্রতি তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও সদাচরণে কোনো তারতম্য দেখা দিত না। *অর্থাৎ কারো সম্পর্কে যদি কোনো সন্দেহ হতো তাহলে তিনি সতর্কও করতেন। তবে এমন নয় যে, তাঁর আরচণ পালটে যাবে; বরং তিনি (সা.) প্রত্যেকের সাথে সদাচরণ করতেন। তবে যেখানে সাবধানতার দাবি ছিল, সেখানে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বিষয়ে সাবধানতাও অবলম্বন করতেন; কারণ সন্দেহভাজন লোকও থাকত।* তিনি (সা.) নিজের সাহাবীদের ওপর দৃষ্টি রাখতেন এবং মানুষের কাছ থেকে তাদের খবরাখবর নিতেন। ভালো কথার প্রশংসা করতেন এবং সেটিকে দৃঢ়তা দিতেন আর মন্দ কথার মন্দ দিক বর্ণনা করতেন এবং এর প্রভাব খর্ব করতেন। তিনি (সা.) প্রত্যেক বিষয়ে মধ্যপন্থি ছিলেন। তিনি স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি (সা.) উদাসীন হতেন না, পাছে মানুষও উদাসীন হয়ে যায় বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তিনি (সা.) যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি (সা.) নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে পিছিয়েও থাকতেন না, আবার সেই অধিকারের সীমাও অতিক্রম করতেন না। যতটুকু অধিকার বা কাজ, ঠিক ততটুকুই তিনি করতেন। মানুষের মাঝে তাঁর (সা.) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল তারা, যারা সবচেয়ে উত্তম ছিল। তাঁর (সা.) দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল সেই ব্যক্তি, যে অন্যের মঙ্গল কামনায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী; এবং তাঁর (সা.) নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে বড়ো হতো সেই ব্যক্তি, যে সমবেদনা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে সর্বাধিক উত্তম। মর্যাদায় সবচেয়ে বড়ো সে-ই, যে মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করে এবং তাদের সাহায্যকারী; এক্ষেত্রে যে সবচেয়ে এগিয়ে থাকত সে তাঁর (সা.) ঘনিষ্ঠ হতো এবং তিনি তাকে পছন্দ করতেন। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর মজলিস বা বৈঠক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি [হযরত আলী (রা.)] বলেন, মহানবী (সা.) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। যখন কোনো বৈঠকে যেতেন তখন সেখানে বসতেন যেখানে সভার শেষ ব্যক্তি বসা থাকত, আর এমনটিই করার নির্দেশ দিতেন। তিনি (সা.) প্রত্যেক সহচরকে তার প্রাপ্য দিতেন, অন্য কেউ তার চেয়ে অধিক সম্মানিত এমন ধারণা কেউ করত না। যে তাঁর পাশে বসত এবং তাঁর কাছে নিজের কোনো প্রয়োজন বর্ণনা করত, তিনি তার সাথে ততক্ষণ বসে থাকতেন যতক্ষণ না সে উঠে চলে যেত। আর কেউ যদি তাঁর (সা.) সামনে নিজের কোনো চাহিদা তুলে ধরত তাহলে তাকে প্রদান করা অথবা নম্রভাবে কথা না বলে বিদায় দিতেন না। *প্রয়োজন নিয়ে কেউ আসলে*

তাকে কিছু দিতেন অথবা দিতে না পারলে অত্যন্ত নম্রভাবে উত্তর দিতেন। তাঁর (সা.) হাস্যোজ্জ্বল মুখ, উদারতা ও এই উত্তম আচরণ সবার জন্য ছিল। তিনি যেন তাদের পিতা হয়ে গিয়েছিলেন। অধিকারের দিক থেকে তাঁর দৃষ্টিতে সবাই সমান ছিল। তাঁর (সা.) বৈঠক জ্ঞান, শালীনতা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ বৈঠক ছিল। এতে কোনো আওয়াজ উঁচু হতো না, সম্মানিত বস্তুসমূহের অসম্মান হতো না, কারো দুর্বলতা বর্ণনা করা হতো না। সবাই পরস্পর সমান হতো এবং তাকওয়ার কারণে একে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন। *পরস্পরের দুর্বলতা বর্ণনা করা হতো না। তাঁর (সা.) বৈঠকে এমনটি কখনো হয় নি।* পরস্পর বিনয়পূর্ণ আচরণ করতেন, বড়োদের সম্মান ও ছোটোদের প্রতি দয়া করতেন। অভাবীকে প্রাধান্য দিতেন এবং অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি যত্নবান থাকতেন। *এমন নয় যে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আসল, তখন তার প্রতি মনোযোগ দেবেন না; তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন।*

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার সন্তুষ্টিতে বিলীন ব্যক্তিরা তাদেরকে কোনো মর্যাদা অথবা নেতৃত্ব প্রদান করা হোক– এমনটি প্রত্যাশা করেন না। এসব মর্যাদার চেয়ে তারা নির্জনবাস ও নিভৃতে ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু খোদা তা'লা তাদেরকে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য দুর্বার আকর্ষণে বাইরে আনেন এবং আবির্ভূত করেন। আমাদের নবীজী (সা.)-ও (নির্জন) গুহাতেই দিন কাটাতেন; কেউ তাকে চিনুক– তা তিনি চাইতেন না। কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বাহিরে বের করেছেন এবং জগতের হিদায়াতের দায়িত্ব তাঁকে ন্যস্ত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে সহস্র সহস্র কবি আসত এবং তাঁর প্রশংসায় কবিতা পাঠ করত। কিন্তু যে মনে করে, মহানবী (সা.) তাদের প্রশংসায় স্ফীত হতেন *অর্থাৎ, খুশি হতেন*– সে হৃদয় অভিশপ্ত। তিনি তাদেরকে মৃত কীটের ন্যায় মনে করতেন। খোদা আকাশ থেকে যে প্রশংসা করেন সেটাই সত্য। যারা খোদা তা'লার ভালোবাসায় বিলীন হন তারা জগতের প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। এটা এমন এক মর্যাদা হয়ে থাকে যে, খোদা আকাশ ও আরশ থেকে তাদের প্রশংসা ও স্তুতি করেন।

অতঃপর হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এক খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি আমাদের নবীজী (সা.)-এর কাছে আসে। মহানবী (সা.) তাকে অনেক আদর-আপ্যায়ন করেন। সে অত্যন্ত ক্ষুধার্থ ছিল; তাকে তিনি (সা.) প্রচুর খাওয়ান যার ফলে তার পেট ভরে যায়। রাতে নিজের কম্বল তাকে দেন। যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন পায়খানার প্রবল বেগ হলে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি আর লেপেই পায়খানা করে দেয়। যখন ভোর হলো তখন সে ভাবে, আমার অবস্থা দেখে [মহানবী (সা.)] অপছন্দ করবেন। সে লজ্জায় বেরিয়ে পড়ে। লোকজন (অবস্থা) দেখে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে, যে খ্রিষ্টান এসেছিল সে লেপ নষ্ট করে চলে গেছে; এতে পায়খানা লেগে আছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে দাও, আমি পরিষ্কার করছি! লোকজন নিবেদন করে, হুযূর! আপনি কেন কষ্ট করবেন? আমরা আছি; আমরা পরিষ্কার করে দেবো। মহানবী (সা.) বলেন, সে আমার অতিথি ছিল, এজন্য এটা আমারই কাজ। তিনি উঠে পানি আনিয়ে নিয়ে নিজেই পরিষ্কার করতে শুরু করেন। *পরম বিনয়ের সাথে অতিথির ময়লা পরিষ্কার করেন।* এক ক্রোশ যাবার পর সেই খ্রিষ্টান ব্যক্তির স্মরণ হলো, তার সোনার ক্রুশটি সে বিছানার ওপর ভুলে ফেলে এসেছে। এজন্য যখন ফেরত আসে তখন দেখে, মহানবী (সা.) লেপ থেকে তার পায়খানা নিজে পরিষ্কার করছেন। সে অনুতপ্ত হয় আর বলে, আমার সাথে এমনটি

ঘটলে তো আমি কখনোই নিজে এটি ধুতাম না! সে ভাবল, এ থেকে বুঝা যায়– যে ব্যক্তি এতটা নিঃস্বার্থ, এত বিনয়ী– তিনি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত! তাঁর (সা.) এই আদর্শ দেখে সে তখন মুসলমান হয়ে গেল।

মহানবী (সা.) এর প্রতি প্রথম যে ওহী হয়েছিল সে সময়ও তাঁর এই বিনয় ও নম্রতারই প্রকাশ ঘটেছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হেরা গুহার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সর্বপ্রথম ওহী হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছিল; যখন জিবরাঈল মহানবী (সা.)-কে দেখেন আর তিনি বলেন, اِقْرَأْ অর্থাৎ পড়। এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, مَا أَنَا بِقَارِئٍ অর্থাৎ আমি পাঠ করতে পারি না। এর মর্মার্থ ছিল, এই বোঝা যেন আমার কাঁধে অর্পণ করা না হয়। কেননা সেই সময় তাঁর (সা.) সামনে কোনো কিতাব তো রাখা হয় নি যা দেখে মহানবী (সা.) পাঠ করবেন। বরং যা কিছু জিবরাঈল বলেছিলেন তা-ই তাঁর (সা.) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার ছিল, আর তিনি (সা.) তা বলতে পারতেন; কিন্তু তিনি (সা.) বিনয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য মহানবী (সা.)-কেই নির্বাচন করেছেন, এজন্য তিনি বার বার বলেছেন– পাঠ করো! অবশেষে তৃতীয়বার বলার পর মহানবী (সা.) পাঠ করেন আর সেই ফেরেশতা সেই আয়াতগুলো পাঠ করান, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ আয়াতগুলো।

এমনিভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা সম্বন্ধে আরও একটি জায়গায়, সম্ভবত তফসীরে কবীরে সূরা আল-কাউসারের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যখন তাঁর (সা.) ওপর ওহী নাযিল হলো তখন তিনি (সা.) অসাধারণ বিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। আমরা দেখি মানুষ কোনো ইলহাম হলে অথবা কোনো স্বপ্ন দেখলে তারা দ্রুত অন্যদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলে, আমাদের প্রতি এই ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে জিবরাঈল আসে আর বলে, اِقْرَأْ– পাঠ করো। তখন তিনি (সা.) বলেন, مَا أَنَا بِقَارِئٍ– **আমি তো পাঠ করতে পারি না!** তিনবার তিনি (সা.) এ কথাই বলেন। কিন্তু যখন তিনি (সা.) দেখেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই কথার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে– তখন তিনি আদেশ পালন করেন এবং এমন বীরত্বের সাথে করেন যে, তিনি (সা.) মূসা (আ.)-এর মতো একথা বলেন নি, হে আমার প্রভু! আমাকে কোনো সঙ্গী দান করো। বরং তিনি (সা.) একাই এই বোঝা বহন করেন আর সাহায্যের জন্য কোনো সহযোগী প্রার্থনা করেন নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন, তাঁর (সা.) বিনয়ের আরেকটি উদাহরণ হলো, একবার একজন আনসারী অসুস্থ হলে তিনি (সা.) তাকে দেখতে যান। ফেরত আসার সময় সেই আনসারী মহানবী (সা.)-কে বাহন হিসেবে একটি ঘোড়া দেন আর নিজের ছেলেকে বলেন, তুমি মহানবী (সা.)-এর সাথে যাও; অন্য কাউকে খুঁজে পেতে তাঁর (সা.) সমস্যা হতে পারে। *অর্থাৎ সাথে সফর করার জন্য অন্য কাউকে হয়ত পাবেন না।* ফেরত আসার সময় ঘোড়াও সাথে করে নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পর তার ছেলে ফেরত আসে। পিতা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর সাথে পাঠিয়েছিলাম পথের নিরাপত্তার জন্য আর ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য; অথচ তুমি ফেরত চলে এসেছ? ছেলে উত্তর দেয়, আমি অপারগ ছিলাম। যখন মহানবী (সা.) বাহিরে বের হলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমিও আমার পেছনে বস। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), আমার পক্ষে এরূপ অশিষ্টাচার করা সম্ভব না! তিনি

(সা.) বললেন, আমার কাছেও এটি সহ্য হবে না যে, তুমি পায়ে হেঁটে যাবে আর আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাব। হয় তুমি আমার সাথে ঘোড়ার পিঠে উঠে বস, নতুবা বাড়ি ফেরত চলে যাও। সেই ছেলে বলে, আমি ফেরত চলে আসাকেই উত্তম মনে করলাম। আর মহানবী (সা.) একাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) একটি চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি যখন ওঠেন তখন তাঁর পিঠে সেই চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা তৈরি করে দিই! তিনি বলেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো কেবল একজন পথিকের মতো, যে কোনো গাছের ছায়ায় একটু বসে, তারপর আবার রওনা হয়ে যায় এবং সেটিকে পরিত্যাগ করে।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত উমর বর্ণিত রেওয়ায়েত রয়েছে; তিনি বলেন, আমি একবার মহানবী (সা.)-এর সকাশে হাজির হই। তিনি তাঁর ঘরের ওপর তলায় অবস্থান করছিলেন এবং সে সময় তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর ছিলেন। তাঁর এবং সেই চাটাইয়ের মাঝখানে কোনো বিছানা ছিল না। তাঁর মাথার নীচে চামড়ার একটি বালিশ ছিল, যার ভেতরে খেজুরের ছাল ভরা ছিল। তাঁর পায়ের কাছে বাবলা গাছের পাতার একটি স্তূপ ছিল এবং তাঁর মাথার কাছে কাঁচা চামড়া ঝুলছিল। আমি তাঁর পিঠে সেই চাটাইয়ের দাগও দেখতে পেলাম। যে মাদুর বা পাটি বিছানো ছিল, তার দাগ দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কান্নার কারণ কী? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কিসরা (পারস্যের সম্রাট) এবং কায়সার (রোমের সম্রাট) কত আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে! অথচ আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়েও এই অবস্থায় আছেন? তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, তাদের জন্য থাকবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য পরকাল?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর পার্থিব ভোগবিলাসের চিত্র দেখুন! একবার হযরত উমর তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি একজন বালককে পাঠিয়ে অনুমতি চাইলেন। মহানবী (সা.) খেজুরের একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। হযরত উমর যখন ভেতরে এলেন, তখন তিনি উঠে বসলেন। হযরত উমর দেখলেন, ঘরটি সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে এবং তাতে সাজসজ্জার কোনো উপকরণ নেই। একটি খুঁটিতে তলোয়ার ঝুলছে অথবা সেই চাটাইটি রয়েছে যার ওপর তিনি শুয়ে ছিলেন এবং যার দাগ ঠিক একইভাবে তাঁর পবিত্র পিঠে বসে গিয়েছিল। হযরত (উমর) এটি দেখে কেঁদে ফেললেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর! তোমার কান্নার কারণ কী? উমর নিবেদন করলেন, কিসরা ও কায়সার তো আরাম-আয়েশের সব উপকরণ ভোগ করে, আর আপনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং দুই জাহানের বাদশা হয়েও এই অবস্থায় আছেন! মহানবী (সা.) বললেন, হে উমর! দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো সেই মুসাফিরের মতো জীবনযাপন করি, যে উটের পিঠে চড়ে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলে, মরুপথে প্রচণ্ড দাবদাহে কোনো গাছ দেখে তার ছায়ায় কিছুটা বিশ্রাম নেয়; আর ঘাম একটু শুকিয়ে যেতেই সে আবার পথ চলতে শুরু করে।

দুশ্চরিত্র বা কটুভাষী লোকদের সাথেও তিনি সর্বদা নম্রতা ও বিনয়ের সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিজের পাওনা দাবি করে এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করে। সাহাবায়ে কেরাম এতে ক্ষিপ্ত হন, কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, কারণ

পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে। যেহেতু তার পাওনা আমাকে পরিশোধ করতেই হবে, তাই সে কথা বলার অধিকার রাখে। তার জন্য একটি উট কিনে তাকে দিয়ে দাও। *অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণের অর্থ চাইতে এসেছিল, তাকে একটি উট কিনে দিয়ে দাও।* সাহাবীগণ বলেন, আমরা তার ঋণের সমমূল্যের কোনো উট পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে বেশি মূল্যের উট পাওয়া যাচ্ছে। *তার উটের চেয়ে কেবল উত্তম উটই পাওয়া যাচ্ছে।* তখন তিনি (সা.) বলেন, সেটিই তাকে কিনে দাও; কারণ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ঋণ পরিশোধে সবচেয়ে উত্তম। বর্তমানে এখানে (তথা আমাদের সমাজে) কিছু ঝগড়াবিবাদ এমন হয় যে, প্রকৃত ঋণ যা পরিশোধ করার কথা– তা-ও তারা দিচ্ছে না এবং উলটো ঝগড়া করে যে, এতেও কিছু কম করো। এ বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝতে পারতাম তবে আমাদের অনেক ঝগড়া-বিবাদ নিরসন হয়ে যেত।

একইভাবে তাঁর (সা.) বিনয়ের অরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে; মক্কা-বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন তখন হযরত আবু বকর নিজের (বৃদ্ধ) পিতাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে হাজির হন। মহানবী (সা.) যখন তাকে দেখেন তখন বলেন, হে আবু বকর! তুমি এই বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ মানুষটিকে ঘরেই থাকতে দিতে; আমি নিজেই তাঁর কাছে চলে যেতাম। এটি শুনে হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার কর্তব্য হলো আপনার সমীপে হাজির হওয়া; আপনার তার কাছে যাওয়া কর্তব্য নয়। হযরত আবু বকর তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে বসান; মহানবী (সা.) তার বুকে হাত বোলান এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি শান্তিতে থাকবেন। অতঃপর আবু কুহাফা ইসলাম কবুল করেন।

অনুরূপভাবে বাড়িতে সাদামাটা জীবনযাপনের বিষয়ে হযরত হাসান কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁর জন্য কোনো পাহারাদার দাঁড়িয়ে থাকত না, আর তাঁর জন্য সকাল-সন্ধ্যা বড়ো বড়ো পাত্রে রাজকীয় খাবারও পরিবেশন করা হতো না; *অর্থাৎ কোনো উচ্চমানের খাবার পরিবেশন করা হতো না।* মহানবী (সা.)-এর সাথে যে দেখা করতে চাইত, সে সহজেই তাঁর সাথে দেখা করতে পারত। তিনি মাটিতে বসতেন, নিজের খাবারও মাটিতে রাখতেন। সাদামাটা ও মোটা কাপড় পরিধান করতেন। গাধার পিঠে চড়তেন হতেন এবং মানুষকে নিজের বাহনের পেছনে বসাতেন। আর খাবার খাওয়ার পর নিজের আঙুলগুলো চেটে নিতেন, অর্থাৎ পরিষ্কার করে খেতেন।

এই আঙুল চেটে খাওয়ার বিষয়ে বুখারীতে একটি হাদীস রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, খাবার খাওয়ার পর হাত পরিষ্কার করার আগে, অর্থাৎ ধোবার আগে নিজের আঙুলগুলো চেটে নেওয়া উচিত। আঙুল চাটার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে হযরত যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ সাহেব নোটে লিখেছেন, হযরত সৈয়দ ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বলেন, এ বিষয়টি সমস্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় এবং সমস্ত ডাক্তার এ বিষয়ে একমত যে, মানুষের হাতের আঙুলে একটি বিশেষ স্পর্শের শক্তি রয়েছে। যেমন, আমরা যদি কোনো কাপড়ের কোমলতা পরখ করতে চাই তবে হাতের আঙুল ছাড়া মসৃণতা অনুমান করতে পারি না। যদিও পুরো শরীরে স্পর্শানুভূতি পাওয়া যায়, কিন্তু হাত ছাড়া– যেমন পা দিয়ে যদি কোমলতা অনুমান করতে হয়, তবে আমরা পুরোপুরি সফল হবো না। হ্যাঁ, একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রভাব রয়েছে যা কেবল হাতের, বরং আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। হাতের আঙুলের সাথে চোখের

বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে– যা একটি মনোযোগ আকর্ষণের যন্ত্র। এ কারণে মেসমারিজম (তথা মনোযোগের মাধ্যমে বশীকরণ) যারা করে, তারা যাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে– তার আঙুলের দিকে চোখ বেশি নিবিষ্ট রাখে। এভাবে যার ওপর প্রভাব বিস্তার করার থাকে, আঙুলের মাধ্যমেই তার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে এবং নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হয়। একইভাবে যেসব ঔষধ হাতে বানানো হয়ে থাকে, সেগুলো বেশি উপকারী হয়। বর্তমান সময়ে সবকিছু যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, কিন্তু সেই যুগে ডাক্তার, চিকিৎসকরাও এটি বলতেন। ডাক্তার ইসমাঈল সাহেব একজন দক্ষ শল্যচিকিৎসক ছিলেন এবং ডাক্তারও ছিলেন। যাহোক, তিনিও একথা বলেছেন যে, **হাতে বানানো ঔষধ মেশিনে প্রস্তুতকৃত ঔষধের চেয়ে বেশি উপকারী হয়ে থাকে**। সুতরাং এই রীতি অনুসারে খাবার গ্রহণ করার সময় মানুষ যখন আঙুলের সাহায্যে খাবার ওঠাবে তখন প্রতিবার খাবার ওঠানোর সময় তার দৃষ্টি আঙুলের ডগায় পড়বে আর সেখানে শুধু তার আঙুলই থাকবে। অতএব, মানুষ যখন খাবার শেষে পানি দিয়ে হাত ধোয়া বা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলার পরিবর্তে আঙুলগুলো চেটে নেয় তখন স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আঙুলে লেগে থাকা খাদ্যের চর্বি ও উপকারী অংশ সরাসরি মানুষের পাকস্থলীতে পৌঁছে যায় আর তা পাকস্থলীর কার্যকারিতা অর্থাৎ হজমশক্তিকে শক্তিশালী করে, ফলে খাবার দ্রুত হজম হয়। তৎকালীন ডাক্তার ও হেকিমদের এমনই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমি জানি না, আজকের দিনের চিকিৎসকরা এর বিরোধিতা করবে কি না। কিন্তু যাহোক, মহানবী (সা.) বলেছেন, **খাবার পর যা হাতে লেগে থাকে তা চেটে খাওয়ার মাঝে অনেক বেশি উপকারিতা রয়েছে**। বুখারীর রেওয়ায়েতে এই শব্দাবলি রয়েছে–

فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

'সে যেন নিজের হাত না মোছে যতক্ষণ না সে তা চেটে নেয়, অথবা বলেছেন, চাটিয়ে নেয়'। ব্যাখ্যাকারীরা অন্য কাউকে দিয়ে চাটানোর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো, সে যেন তার সেবক অথবা নিজের পুত্র বা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে আঙুল চাটিয়ে নেয়, যে তা ঘৃণা না করে। এখন যে খাবার খাবে, তার অন্য কাউকে দিয়ে হাত চাটানো কী প্রয়োজন? সে নিজেই তো চেটে নিতে পারে? বস্তুত ব্যাখ্যাকারীরা অনেক সময় অতিরঞ্জন করে থাকেন। এ বিষয়টি যথাযথ নয় এবং এটি মানব মর্যাদার পরিপন্থি প্রতীয়মান হয় যে, অন্য কাউকে বলা হবে– আমার আঙুল চেটে দাও। যাহোক, এর অর্থ এটিও হতে পারে যে, মানুষ খাবার খাওয়ার পর নিজের আঙুল নিজেই চেটে পরিষ্কার করবে এবং তার অধীনস্থ ও প্রশিক্ষণার্থীদেরও বলবে, তারাও যেন নিজেদের আঙুল নিজেরাই চেটে পরিষ্কার করে নেয়, যেন এই স্বাস্থ্যগত উপকারিতা ও অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে যা মহানবী (সা.)-এর উক্ত নির্দেশনার মাঝে নিহিত।

মসজিদ পরিষ্কার বা ঝাড়া-মোছার কাজকে তিনি কখনও লজ্জার বিষয় মনে করেন নি। ইয়াকুব বিন যায়েদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মসজিদে আসা বাইরের ধুলোবালি একটি লাঠি দিয়ে পরিষ্কার করতেন। সম্ভবত এর অর্থ হলো, লাঠির মাথায় কোনো কাপড় ইত্যাদি বেঁধে সেটি দিয়ে ঝুল ইত্যাদি ঝাড়তেন বা পরিষ্কার করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর পাশে বসা ছিলেন, তখন তিনি (সা.) আকাশের দিকে তাকালে এক

ফেরেশতাকে অবতীর্ণ হতে দেখেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, এটি সেই ফেরেশতা যে নিজের জন্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত কখনও অবতীর্ণ হয় নি। যখন সেই ফেরেশতা অবতীর্ণ হন তখন বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার প্রভু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা জানতে চেয়েছেন, তিনি কি আপনাকে বাদশা নবী বানাবেন, নাকি বান্দা রসূল বানাবেন? হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! নিজ প্রভুর সমীপে বিনয় অবলম্বন করুন। মহানবী (সা.) বলেন, বেশ! আমাকে যেন বান্দা রসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। এটি মহানবী (সা.)-এর সহজাত প্রকৃতি ছিল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যদি না-ও বলতেন, তবুও তিনি (সা.) এটিই বলতেন আর এ বিষয়টিরই তিনি (সা.) সর্বদা উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর মান্যকারীদেরও বলেছেন, **আমি একজন মানব রসূল**। যাহোক, এই হাদীসের অর্থ হলো, যখনই তিনি (সা.) সুযোগ পেতেন তখনই বিনয়ের সাথে একথাই বলতেন যে, আমি বাদশা রসূল হতে চাই না, আমি আল্লাহ্‌র একজন বিনয়ী বান্দা এবং তাঁর রসূল হতে চাই; আর এটিই আমাদের কলেমায় উল্লেখ হয়েছে।

একজন প্রকৃত মুসলমানের কেমন বিনয়ী হওয়া উচিত– একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আইয়ায বিন হিমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয় আমাকে ওহী করেছেন যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করো, এমনকি কেউ যেন কারো প্রতি অবিচার না করে, আর কেউ যেন কারো সাথে অহংকার না দেখায়।

তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাস হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, বিনয় অবলম্বন করা উচিত। বিনয় শেখা কোনো কঠিন কাজ না। আর তা শেখারই বা কী আছে? মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবেই বিনয়ী এবং মানুষকে বিনত হবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [যারিয়াত:৫৭]

'আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।' অহংকার ইত্যাদি সবই কৃত্রিম জিনিস। যদি সে এই কৃত্রিমতাকে পরিত্যাগ করে তবে তার স্বভাবে (কেবল) বিনয় দৃষ্টিগোচর হবে।

আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে এবং মহানবী (সা.)-এর বিনয়ের মান উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা। তিনি মানুষকে সর্বতোভাবে লালনপালন করেন এবং তার প্রতি দয়া করেন। আর সেই দয়ার কারণেই তিনি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট এবং নবী-রসূলদেরকে প্রেরণ করে থাকেন যেন তারা পৃথিবীবাসীকে পাপে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু অহংকার একটি বিপজ্জনক ব্যাধি। যে ব্যক্তির মাঝে এর জন্ম হয়, তার জন্য এটি একটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই রোগটি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। অহংকারী শয়তানের ভাই হয়ে যায়। কারণ অহংকার শয়তানকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল। এ জন্য মু'মিন হবার শর্ত হলো, তার মাঝে যেন অহংকার না থাকে বরং নিরহংকার, বিনয় ও নম্রতা যেন তার মাঝে থাকে, আর এটি খোদার প্রত্যাদিষ্ট বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। তাদের মাঝে চরম পর্যায়ের বিনম্রতা ও বিনয় থাকে এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে এই গুণটি অন্য সকলের চেয়ে সর্বাধিক ছিল। তাঁর (সা.) একজন সেবককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার সাথে তিনি কেমন ব্যবহার করেন? তিনি বলেন, আসল কথা হলো,

আমার চেয়ে বেশি তিনি আমার সেবা করেন! **'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম'**।

এটি হলো উন্নত চরিত্র ও বিনয়ের (একটি) দৃষ্টান্ত। আর এ কথা সত্য যে, যারা (কোনো ব্যক্তির) সেবা করে তারা তার প্রিয়জনদের মধ্য থেকেই আসেন এবং সবসময় তার পাশেই থাকেন। তাই যদি কারো নম্রতা, বিনয়, সহনশীলতা এবং ধৈর্য সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়, তবে তাদের কাছ থেকে জানা যেতে পারে। কতক পুরুষ বা নারী এমন হয়ে থাকে, কোনো কাজে ভৃত্যের সামান্য কোনো ভুলচুক হলে, উদাহরণস্বরূপ চায়ে কোনো খুঁত হলে সাথে সাথে তাকে গালি দেওয়া শুরু করে অথবা চাবুক দিয়ে পেটানো শুরু করে। অথবা (তরকারির) ঝোলে সামান্য লবণ বেশি হলে বেচারা ভৃত্যের ওপর আযাব নেমে আসে। অন্য গরিবদের সাথে তাদের আচার-আচরণ ভিন্ন হয়, কেননা তারা অনাহারে থাকে এবং শুকনো রুটি খেয়ে দিন কাটায়। কিন্তু এরা (ধর্মীয়) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাদের কোনো পরোয়া করে না। তারা তখন এদেরকে পরীক্ষায় ফেলে, যখন তারা সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে আসে। *গরিব যখন সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে আসে তখন ধনীদের কাছে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কারণ তাদের চাহিদা পূরণ করার মাঝেই তো আসল পুণ্য নিহিত।* খোদা তা'লা তো প্রতিটি ধূলিকণারও সৃষ্টিকর্তা। কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে পারবে না। দরিদ্রদের সাথে আচরণ দেখেই বোঝা যায়– সে কতটা খোদাভীতি বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছে বা দেবে। কতটা খোদাভীতি রয়েছে তা দরিদ্রদের সাথে আচরণ দেখেই বোঝা যায়, ধনীদের সাথে ভালো আচরণের মাধ্যমে নয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং তাঁর সুন্নতের পথে পরিচালিত হয়ে বিনয়ের পথ অবলম্বন করার সৌভাগ্য দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো, যা মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের পুত্র মুকাররম মালিক দাউদ সাহেবের; তার আদিনিবাস ছিল ভিহাড়ি, ইদানিং করাচিতে থাকতেন; তিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তাঁর দাদা মুহাম্মদ দীন সাহেব শিয়ালকোট জেলার বারতাওয়ালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মালিক দাউদ সাহেব স্থানীয় পর্যায়ে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি মাল এবং আনসারুল্লাহ্ সংগঠনের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে গিয়েছেন। তার এক পুত্র হলেন মুহাম্মদ আকমল সাহেব যিনি মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে গাম্বিয়ায় সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি তার পিতার জানাযায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

তার পুত্র মুরব্বী সিলসিলাহ আকমল সাহেব লেখেন, আমার বাবা একজন অমায়িক, হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত এক মানুষ ছিলেন। তবলীগের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি যখনই সিন্ধে নিজ জমি দেখতে যেতেন, সেখানেও তবলীগ করার সুযোগ খুঁজতেন ও লোকদের তবলীগ করতেন। পাকিস্তানে কঠোর আইন পাস হবার আগ পর্যন্ত তিনি নিজের সঙ্গে জামা'তের প্রচারপত্র রাখতেন ও এর মাধ্যমে সর্বদা তবলীগ করতেন। আর এর মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের ওপর প্রভাবও রাখতেন।

তিনি খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন; যেখান থেকেই অতিথি আসত, কেন্দ্র থেকে হোক বা অন্য কোথাও থেকেই হোক– তিনি সকলের আতিথিয়েতা করতেন। নিয়মিত নামায সেন্টার হবার আগ পর্যন্ত নিজ বাড়িতেই নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলেন আর সেখানে নিয়মিত বাজামা'ত নামায হতো। ফজরের নামাযের পর তিনি খুব উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কুরআনও তিলাওয়াত করতেন। তার প্রতিষ্ঠিত একটি নামায সেন্টারে অন্যান্য জামা'তের লোকেরাও জুমুআর নামায পড়ার জন্য আসতেন।

তিনি নিজের ক্ষেতে যেতেন; তিনি বলতেন, আমি আমার ক্ষেতে গিয়ে এর প্রতিটি কোণায় নফল নামায আদায় করি, আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমার ফসলে বরকত দান করেন এবং অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ ফসল লাভ হয়।

অনুরূপভাবে তিনি নিজ গ্রামে যে বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটির ব্যাপারে তিনি তার নিজ সন্তানদের বলেছিলেন, আমি স্থায়ীভাবে আমার সম্পদের সবটুকুই জামা'তকে দান করে দিতে চাই যেন সেখানে জামা'তের সেন্টার তৈরি হয়। এরপর তিনি তা জামা'তকে দিয়েও দিয়েছেন।

আতিথেয়তা ছিল তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এছাড়া মানবসেবা, জামা'তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও খুতবা শোনা ছিল তার বিশেষ গুণ। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)